উত্তমকুমার কে ছিলেন ?

অনেক রকম উত্তর পাওয়া যেতে পারে। তার মধ্যে নায়ক বা অভিনেতার ভূমিকা সবথেকে গৌণ। চলচ্চিত্রে অভিনয় শুরু করবার বিশ বছরের মধ্যেই তিনি বাঙালির মিথোলজির অন্তর্ভুক্ত হন। ষাট দশকের মাঝামাঝি তপন সিংহের ‘গল্প হলেও সত্যি’ ছবিতে ফিল্ম সোসাইটি ও বুদ্ধিজীবী বাঙালি ইগোকে প্রতিস্থাপিত করে উত্তমকুমারের উপকথা। খেয়াল করার যে, এই ছবির চরিত্রলিপিতে উত্তম কোথাও নেই। অন্দর মহলে সংসারের দুপুরের অবসরে হালকা সিনেমা পত্রিকা থেকে উত্তমচরিত মানস গঠন করেন দুই মহিলা আর এই বাড়িরই তরুণতম প্রতিনিধি ফিল্ম সোসাইটির আদলে ‘ত্রুফো’ উচ্চারণ করে। উত্তমরহস্য এভাবেই সংস্কৃতির অচেনা স্তর থেকে স্তরান্তরে ছড়িয়ে যায়।

যে কোনও চরিত্রই অতিকথার জন্ম দিতে পারে যদি তা কোনও সন্দর্ভের প্ররোচনা পায়। উত্তমকুমার আমাদের সমাজে, গল্পে – গুজবে, কেশবিন্যাসে ও চালচলনে শুধু ‘স-জীবনী’ অভিনেতা নন, তিনি যে অতিকথার জন্ম দিলেন তা তাঁর অভিনয় প্রতিভার জন্যও নয়। বরং সেই মুহূর্তগুলির জন্য যা এই অভিনয়কে বাস্তবায়িত করে। মনস্বী রল্যাঁ বার্ত থাকলে বলতেন মিথ এমন একটি বাচন যা ইতিহাসের দ্বারা নির্বাচিত। কিংবদন্তীরও ঐতিহাসিক ভিত্তি থাকে।

আসলে সুভাষচন্দ্র বসু যে কারণে স্বাধীনতার পরে নেতাজি হয়ে গেলেন। উত্তমকুমারও প্রায় সে কারণেই মহানায়ক হয়ে গেলেন। দুজনেরই ইতিহাস থেকে অন্তর্ধানের সুযোগ ঘটেছিল। সত্যি কথা বলতে কি তথাকথিত বিমান দুর্ঘটনার পর সুভাষচন্দ্রের আর কোনও দায় রইল না ইতিহাসের কাছে জবাবদিহির। সে কারণেই তিনি বিভাজনোত্তর দেশে, অন্তত পশ্চিমবাংলা ও পাঞ্জাবে, যে কোনও অত্যাচার ও বঞ্চনার প্রেক্ষাপটে সামরিক উর্দি পরিহিত নেতাজি হিসেবে দেখা দেন। তিনি আছেন এই তো যথেষ্ট! সম্ভবামি যুগে যুগে! বলাবাহুল্য উত্তমকুমারের সাংস্কৃতিক কৌলিন্য না থাকাই তার প্রধান ছাড়পত্র। অর্থাৎ তিনি জনসাধারণের একজন।

‘শাপমোচন’-এর নায়কের ‘অপরাজিত’-র নায়ক অপূর্ব কুমার রায়ের মত সাংস্কৃতিক আভিজাত্য নেই, কিন্তু প্রায় একই সময়ে সে অপূর্বর মতো কলকাতায় আসে। গ্রাম থেকে শহরে আসার এই আখ্যানে উত্তমকুমার প্রায় অস্টারলিটজ ফেরত নেপোলিয়নের মতই জনসাধারণের মন লুঠ করে নেন। শহরের মধ্যে এক অলীক গ্রাম তৈরি হয় এবং উত্তমকুমার সেই নগরপল্লিতে লোকগাথার অবিসম্বাদিত সম্রাট হয়ে ওঠেন।

উত্তমকুমার, না বিধান রায় না জ্যোতি বসু, তার ক্যারিসমা একের পর এক সংকট অনায়াসে পার হয়ে যায়। উপরন্তু শেষ পঞ্চাশ ও ষাটের দশকের সামাজিক দোলাচলের দিকে তাকালে মনে হয় ছবির পর্দায় এমন এক শান্তিনিকেতন তিনি গড়তে পারছিলেন যেখানে স্থিতাবস্থাই সত্য। ‘শাপমোচন’ ও ‘অ্যান্টনি ফিরিঙ্গি’ এবং ‘দেয়া–নেয়া’ গানের বদলে প্রেমের আদর্শকেই তুলে ধরে। তাঁর গরিব চরিত্ররা বড়লোক হওয়ার শর্তেই নায়িকাদের সঙ্গে পুনর্মিলিত হয়। মূল মতাদর্শ তাঁর উপস্থিতিতে কখনোই বিপন্ন বোধ করে না। যতই তিনি বড় অভিনেতা হিসেবে পরিচিতি প্রতিষ্ঠিত করেন ততই শিল্প সিনেমার উপেক্ষা, বঞ্চনার সত্য হিসেবে জনসাধারনের হৃদয় মথিত করে। তাঁর রাজ্যপাট নিরঙ্কুশ হয়ে যায়।

বস্তুত উত্তমকুমারকে বাংলার মুখ বলা যদি অতিশয়োক্তি হয়ও, তিনি বাঙালিয়ানার এক ধরনের মুদ্রা। যে আংটি দেখে দুষ্মন্ত শকুন্তলাকে চেনেন, যা হারানো সুর় আমাদের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতায় বাঙালিকে চেনার সেরকম আংটি , সেরকম সুর, নিশ্চিতভাবেই উত্তমকুমার। অথচ উত্তমকুমার বাঙালির মানস পটে অনুপস্থিতির সত্য, জীবৎকালে সংস্কৃতির নীল রক্ত তার ললাট টীকা হয়ে দেখা দেয়নি, আপাতভাবে এই কারণ তাকে বারবার ফিরিয়ে এনেছে। যেন তিনি সত্যিই প্রান্তিক ও সংখ্যালঘু। আসলে গরিবের ছেলের বঞ্চনার একটা প্রতিকার গরিবরা চাইবেন। বাংলা ছবিতে অনেকসময়ই উত্তমকুমার কাজ করে যাচ্ছেন এই প্রতিকার্য হিসেবেই।

সত্যজিৎ রায় যে ম্যাটিনি আইডল হিসেবে উত্তমবাবুকে বেছে নিয়েছিলেন তা প্রায় নির্বিকল্প হয়েই। বস্তুত অরিন্দমের অন্য কোনও অভিনেতা থাকা সম্ভব নয়। বাঙালি নক্ষত্রের কাছে যে যে কারণে হাত পাতে, উত্তম তার প্রায় সবকটি পূরণ করতে পারতেন। নায়কের ‘নায়ক’ অভিনয় বাঙালির সবচেয়ে প্রামাণ্য বাস্তব। সত্যজিৎ রায় শিল্পী বলেই জানতেন, উত্তমকুমার যখন শিল্পী নন তখনও নায়ক। এবং দিগন্তের ঈষৎ দূরে় যেন দেবদাস় আমাদের চেতনায় প্রয়শ্চিত্তের অপর বিন্দু় মদ, নারী ও নরক, দেবদাস বা উত্তমকুমারের পা টলায় না। উপন্যাস, সিনেমা ও খবরের কাগজের পরপারে তারা আমাদের জ্যান্ত রূপকথা।